খোলা মুঠি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অঞ্জলিতে ছেলেবেলা

এই তো আমার অঞ্জলিতেই মস্ত পুকুর,
কেউ আচম্‌কা ছুঁড়লে ঢেলা
দেখতে থাকি কেমন করে প্রকাশ্য হয়
খুব নগণ্য ছেলেবেলা।

দর্পণে মুখ লগ্ন রেখে ছোট্ট খুকুর
এখন দিব্যি কাটে সময়।
কাটুক, এখন হাওয়ায় উড়ছে অনভ্যস্ত শাড়ির আঁচল,
অঞ্জলিতে টলটলে জল।

পৌঢ় বোঝে পৌঢ়তা কী, বৃদ্ধ বোঝে
বয়স বলতে কী ঝামেলা,
কিন্তু খুকু, এখন তুমি এতই অল্পবয়স্ক যে,
তোমার উপলব্ধিতে নেই ছেলেবেলা।

যখন থাকবে, তখন তুমি অনেক বড়,
কিন্তু, তখন আর-এক শীতে
নজর করলে দেখতে পাবে, কেমনতরো
জলের বর্ণ পালটে গেছে অঞ্জলিতে।

কেউ বলে জল, কেউ-বা স্মৃতি, কেউ-বা সময়,
কেউ আচম্‌কা ছুঁড়লে ঢেলা
হঠাৎ যেন একটু-একটু প্রকাশ্য হয়
খুব নগণ্য ছেলেবেলা।

অরণ্য-বাংলোয় রাত্রি

নাকারা নাকারা কারা কারা...
ঘুমের গহ্বর থেকে মধ্যরাতে জেগে উঠল পাড়া
অরণ্যের অন্দর-মহলে।
আকাশ নির্মল নয়, কিছু জ্যোৎস্না ছড়াবার ছলে
জলেস্থলে চতুর্গুণ রহস্য ছড়ায়
হলুদ বর্ণের চাঁদ। কে যায়, কে মধ্যরাতে
দ্রুত হাতে
বিপদের সংকেত বাজিয়ে দিয়ে চলে যায়?
সমগ্র সত্তায় খেয়ে নাড়া
উৎকর্ণ অরণ্য শোনে : নাকারা নাকারা কারা কারা...

কিসের বিপদ? আজও অগ্নির বলয় দেখে হটে যেতে যেতে
পর্বতসানুর ভুট্টাক্ষেতে
ফিরে এসেছিল নাকি হাতির দঙ্গল?
অথবা ঝরনার জল

খেতে এসেছিল ধূর্তবাঘ?
জ্যোৎস্না ও আঁধার ষড়যন্ত্র করে ফুটিয়েছে হল্‌দে-কালো দাগ
বাংলোর উঠোনে। রাংচিতের জানলায়
একবার দাঁড়িয়ে ফের ক্ষিপ্র পায়ে কারা নেমে যায়
নীচের জঙ্গলে? সারা
অরণ্যের চিত্তে বাজে : নাকারা নাকারা কারা কারা...

কিছু কি জানাচ্ছে কেউ? কী জানাচ্ছে? পালাও-পালাও...
শত্রু আসছে, সরে যাও–
এই কথা? ধূমল আকাশে
কুয়াশায় আচ্ছন্ন সমুদ্রজলে ভাসে
হলুদ বর্ণের চাঁদ! খাদের স্যাঁতস্যাঁতে মাটি, পচা ঘাসপাতার জঞ্জাল
পায়ের তলায় চেপে দীর্ঘ শাল
দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির অন্ধকারে। হান্‌টিং পয়েন্‌ট থেকে দেখা যায়,
চল্লিশ মেইল দূরে নিয়নের প্রগল্‌ভ ঝঞ্ঝায়
হাসছে কিরিবুরু, বিশ্বকর্মার শহর।

কিছু স্তব্ধতার পরে বাতাসে আবার শুকনো ডালপালার স্বর
জেগে ওঠে। আবার ঝরনার জলধারা
খাদের ভিতরে বুনো খরগোশের পিপাশা মেটায়।
জানি না কে এসেছিল, স্বপ্নের ভিতরে শুধু দোলা দিয়ে যায়
নাকারা নাকারা কারা কারা...

এ কেমন বিদ্যাসাগর

আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি আজ
হাজার টুকরো হয়ে
হাজার জায়গায় ছড়িয়ে আছে।
আমার বালিকাবয়সী কন্যা যেমন
নতজানু হয়ে
তার ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট পুঁতিগুলিকে
একটি-একটি করে কুড়িয়ে নেয়,
আমিও তেমনি
আমার ছত্রখান সেই বিগত-জীবনের হৃত্প্রদেশে
নতজানু হয়ে বসি,
এবং নতুন করে আবার মালা গাঁথবার জন্যে
তার টুকরোগুলিকে
যত্ন করে কুড়িয়ে তুলতে চাই।

কিন্তু পারি না।
আমারই জীবনের কয়েকটি অংশ আমার
হঠাৎ কেমন অচেনা ঠেকতে থাকে,
এবং কয়েকটি অংশ আমাকে চোখ মেরে আরও
দূরে গড়িয়ে যায়।
আমি বুঝতে পারি,
গঙ্গাতীরের তীর্থের দিকে পা বাড়ালেই এখন
বৃত্রাসুর আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। এবং
মাসির-কান-কামড়ানো সেই ছেলেটা আর কিছুতেই
বাদুড়বাগানে পৌঁছতে দেবে না।

স্তব্ধ হয়ে আমি বসে থাকি।
উইয়ে-খাওয়া বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়তে থাকে।
আমি চিনে উঠতে পারি না যে,
এ কেমন হেমচন্দ্র, আর
এ কেমন বিদ্যাসাগর।

তখন পিছন থেকে আমি আবার
সামনের দিকে চোখ ফেরাই।
এবং আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে,
অতীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন
বর্তমানের এই কবন্ধ কলকাতাই আমার নিয়তি ;
যেখানে
'কবিতীর্থ' বলতে কোনো কবির কথা কারও মনে পড়ে না,
এবং 'বিদ্যাসাগর' বলতে–
তেজস্বী কোনো মানুষের মুখচ্ছবির বদলে–
ইশকুল, কলেজ, থানা, বস্তি,
অট্টালিকা, খাটাল, পোস্ টার, ও পয়ঃপ্রণালী-সহ
আস্ত একটা নির্বাচনকেন্দ্র
আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কাম্ সেপটেমবর

কনেকটিকাট অ্যাভেনিউয়ের উপরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম।
তখন সেপটেমবর মাস,
নতুন বিশ্বে গাছের পাতা তখন হলুদ হয়ে যাচ্ছে।
শেষ রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল,
রাস্তার উপরে তার চিহ্ন তখনও মুছে যায়নি।
ইতস্তত জলের বৃত্ত,
তার মধ্যে ঝিকিয়ে উঠছে সকালবেলার রোদ্দুর।
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলুম।
কাফেটেরিয়ায় গান বাজছিল:
কাম্ সেপটেমবর।

আমি দেখেছিলুম যে, উত্তর গোলার্ধে শরৎ এসেছে,
গাছের পাতা অগ্নিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে,
এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে,
হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে মেপ্‌ল আর সাইপ্রিসের পাতা।
আমি ভাবছিলুম যে, এখন শরৎকাল,
পৃথিবীর এখন সাজ ফেরাবার সময়।

কনেটিকাট অ্যাভেনিউয়ের উপরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম,
বুক ভরে আমি নিশ্বাস নিচ্ছিলুম,
কাফেটেরিয়ায় গান বাজছিল:
কাম্ সেপটেমবর।
আমার চতুর্দিকে কালো মানুষের ভিড়।
আমার ভীষণ ভাল লাগছিল।

খোলা মুঠি

মুঠি খোলো,
কী আছে দেখাও।
কিছু নেই,
পথে-পথে শিশুরা যা কুড়িয়ে বেড়ায়
বারো মাস,
তা ছাড়া কিছুই নেই।

মুঠি খোলো,
কী আছে গোপন, দেখতে দাও।
এই দ্যাখো,
পথে-পথে যা-কিছুতে উড়িয়ে বেড়ায়
খেয়ালি বাতাস,
তা ছাড়া কিছুই নেই।
কিছু ধুলো, কিছু বালি, কিছু-বা শুকনো পাতা ঘাস।

নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায়

এখন নিজস্ব শ্রমে যাবতীয় উদ্যানের বেড়া
বেঁধে দিতে ইচ্ছা হয়।
স্নেহের চুম্বনখানি এঁকে দিতে ইচ্ছা হয়
সমস্ত শিশুর গালে।
সমস্ত দেওয়ালে

এখন নিজস্ব হাতে নিজস্ব ভাষায় গিয়ে লিখবার সময়:
কে ভালবাসার দিকে তুলেছ বন্দুক,
দূরে যাও।

ভালবাসা ছাড়া কি দ্বিতীয় কোনো উচ্চারণ
মানায় কবির কণ্ঠে?
অস্ত্র নিয়েছিলে হাতে, এই দৃশ্য দেখেছি সবাই।
কিন্তু কে না জানে,
লক্ষ্যের বিচারে সেও শুদ্ধ ভালবাসারই সংগ্রাম।

ভালবাসা কবিতারই অন্য নাম।
যে-নাম হৃদয়ে তুমি উৎকীর্ণ করেছ, তাই জানো:
এখন সমস্ত মিথ্যা
কদর্য-অক্ষরে-লেখা সব গ্লানি ভুলবার সময়।

এখন নিজস্ব হাতে সকলকে সুশ্রী করে তুলবার সময়।
নিজস্ব ভাষায়
অঙ্কুরিত প্রতিটি বীজের কাছে নতজানু হয়ে
এখন বলবার লগ্ন:
গোপন থেকো না বৃক্ষ, তোমার নিজস্ব আলো নিজস্ব হাওয়ায়
নিজস্ব নিয়মে বেড়ে ওঠো।

বকুল, বকুল, বকুল

‘সামনে রিফুকর্ম চলছে,
পিছন দিকে রাস্তা বন্ধ!’
এই, ওরা কী যা-তা বলছে!
বকুল, তোমার বুকের গন্ধ
এই অবেলায় মনে পড়ে।

এই অবেলায় বকুল ঝরে
শ্যামবাজারে, ধর্মতলায়,
এবং আমরা তাকেই ধরছি
ফাঁদ পেতে চৌষট্টি কলায়।

এবং আমরা রাস্তাঘাটে
ফুটপাতে আর গড়ের মাঠে
কুড়িয়ে নিচ্ছি ছেলেবেলা।

‘সন্ধ্যারাতে এ কোন্ খেলা?’
এই, ওরা কী যা-তা বলছে!
মাথার মধ্যে ফুলের গন্ধ।
সামনে সেলাই-ফোঁড়াই চলছে,
পিছন দিকে রাস্তা বন্ধ।

বুকের মধ্যে চোরাবালি

অন্ধকারের মধ্যে পরামর্শ করে
গাছগাছালি,

আজ এই রাত্রে কার ভাল আর
মন্দ কার।
হাওয়ার ঠাণ্ডা আঙুল গিয়ে স্পর্শ করে
ঠিক যেখানে
বুকের মধ্যে নদী, নদীর বুকের মধ্যে
চোরাবালি।
স্রোতের টানে
আশিরনখ শিউরে ওঠে অন্ধকা

শব্দে শব্দে টেরাকোটা

আমি কি তোমার কাছে সনন্দ দিয়েছি কবিতার,
যে আমি তোমার জন্যে যাব
পাতালে, অথবা ঊর্ধ্বে আকাশে ফোটাব
তোমারই আলেখ্য? ঝানু বুড়ো,
আমি কি তোমার কাছে সনন্দ নিয়েছি কবিতার?

যে যার নিজস্ব শিল্প সমূহ অর্জন করে নেয়।
নির্ভয়ে যে যার
কবিতার হস্তপদমুড়ো
অর্থাৎ শব্দকে ঘোর চুল্লির ভিতরে ঠেলে দেয়
চিরকাল। আদ্যন্ত এইভাবে হয়ে খাঁটি
বর্ষার বিরুদ্ধে লড়ে মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটি

আমি কি তোমার কাছে সনন্দ নিয়েছি কবিতার,
যে আমি তোমার কীর্তি গেয়ে
ধন্য হবে? তুমি কি জিহ্বায়
জেনেছ অগ্নির স্বাদ? শব্দের সংসারে তুমি কে হে?

কিছু শব্দ অগ্নিকুণ্ডে ঝরে গিয়েছিল্ম তা-ই যায়।
কিছু যায় ভিখারির পাত্রে। কিছু ফোটে
রমণীর জঙ্ঘাদেশে। কিছু হরিচন্দনের ফোঁটা
হয়ে নিদ্রাহীন গ্রীষ্মরাত্রির আকাশে জ্বলে ওঠে
দুই লহমার জন্যে। কিছু শব্দ আর-একটু দীর্ঘায়ু হতে চায়।
এবং তখনই
শব্দের হৃদপিণ্ডে ছেনি-হাতুড়ির ধ্বনি
লাগে, শব্দে জেগে ওঠে বিষ্ণুমন্দিরের টেরাকোটা।